ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
১৭ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০৫০-২০০৬

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযান বিষয়ক উপ-মহাসচিব এর নিকট এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

জঁ-ম্যারিঁ গোয়েহানো
শান্তিরক্ষা অভিযান বিষয়ক উপ-মহাসচিব
প্রযত্নেঃ মহাসচিবের মুখপাত্রের দপ্তর
জাতিসংঘ
এস-৩৭৮ নিউইয়র্ক
ইউএসএ

ফ্যাক্সঃ +১ ২১২ ৯৬৩ ৭০৫৫/২১৫৫

প্রিয় জনাব গোয়েহানো,

বাংলাদেশঃ সরকার র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন নিষিদ্ধ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশীদের শান্তিরক্ষায় মোতায়েন জাতিসংঘের বন্ধ রাখা উচিত

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) আপনার মনোযোগ আকর্ষন করতে চায় এই সত্যের প্রতি যে, বিদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ থেকে মোতায়েনকৃত সদস্যরা তাদের নিজের দেশে প্রথাগত ও গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী, এবং আরোও অনুরোধ করছে যে, নিম্নে উল্লেখিত কারনগুলোর জন্য যতক্ষন না বাংলাদেশ সরকার তাদের র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে, ততক্ষন বাংলাদেশ থেকে আর কাউকে উক্ত মিশনে মোতায়েনের বিষয় স্থগিত রাখার বিষয়ে আপনি তাদের ভুমিকা পর্যালোচনা করবেন।

আপনি খুবই ভাল জানেন যে, বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাদের দশ হাজারেরও অধিক নাগরিক নিয়োজিত রয়েছে। এই অভিযানগুলোতে অংশ নিয়ে দেশটি প্রচুর সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করছে। আমরাও শান্তিরক্ষা মিশনের কাজ সম্পাদনের জন্য আপনার দপ্তরের কর্মকান্ডের এবং বাংলাদেশের মত দেশগুলো বিশ্বব্যাপী বিরোধ নিরসনে যে অবদান রাখছে, তার ভূয়শী প্রশংসা করি। নিঃসন্দেহে আপনার এই কাজ অবশ্যই চালু রাখা ও শক্তিশালী করা দরকারঃ এই কাজ এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে আপনার প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন রয়েছে।

আমরা উদ্বিগ্নও বটে, যেমনটা আপনিও হবেন, এই জন্য যে, শান্তিরক্ষীরা হলেন পেশাদারিত্ব ও আত্মমর্যাদার শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গ, যারা জাতিসংঘের নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক মানবিকতা ও মানবাধিকার আইনকে উর্দ্ধে তুলে ধরেন এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেনঃ এমনকি, তারা এমনই ব্যক্তিবর্গ যে, মিশনে তাদের দায়িত্বপালন শেষ হওয়ার বহুদিন পরেও তাদের নিয়ে জাতিসংঘ গর্ববোধ করে। শন্তিরক্ষীরা শুধু বিদেশেই নয়, বরং দায়িত্ব পালন শেষে তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার পরেও জাতিসংঘের দুত হয়ে থেকে যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে, মাঠ পর্যায়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর দ্বারা কৃত অপকর্মের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ধর্ষন ও যৌন হয়রানী এবং অভিযান পরিচালনাকালে সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত

করা। আপনি এসব উদ্বেগজনক বিষয়ের প্রতি ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে আমরা অবগত। কিন্তু, একটি বিষয়ে আমরা পুরোপুরি অবগত নই যেই সব দেশের সেনা, পুলিশ এবং অন্যান্য বাহিনীগুলোর নামে তাদের নিজ জনগণের মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আপনার দপ্তর আসলে কি ব্যবস্থা নিয়েছে বা আদৌ নিয়েছে কি-না।

২০০৫ সালে ক্রমাগত গণহারে গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যা ও অন্যান্য গুরুতর লংঘন চলাকালে নেপাল থেকে সেনা মোতায়েন করার বিষয়ে এএইচআরসি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রাজকীয় নেপালী সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে নিজ দেশে নৃশংসতার অভিযোগ পর্যালোচনা করার বিষয় কার্যকর করায় তখন আমরা আপনার প্রশংসা করেছিলাম। আমরা এখন বেশ কিছু কারণে বাংলাদেশ থেকে পুলিশ ও সৈন্যদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে একই ধরণের পর্যালোচনা করার আহবান জানাচ্ছি। তার বেশ কিছু ব্যাখ্যাও রয়েছে।

২০০২ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ সরকার "ক্লীন হার্ট" নামে সন্ত্রাস-বিরোধী এক যৌথ অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিল, যা- মাত্র তিন মাসে ৫৮টি হেফাজতে মৃত্যু এবং আনুমানিক ১১ হাজার বা তারও অধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন চালিয়েছিল- যাদের মধ্যে অন্ততঃ ৮ হাজার সম্পূর্ণ নিরীহ মানুষ- যাদের কারো নামেই পূর্বে একটি মামলাও কখনও দায়ের হয়নি। উক্ত সময়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে উদ্ভুত অপকর্মের অভিযোগের ক্ষেত্রে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থার কবল থেকে ২০০৩ সালে তাদেরকে সরকার দায়মুক্তি নিশ্চিত করেছিল। উক্ত অভিযান ও দায়মুক্তি আইন, উভয়ই জাতিসংঘের স্বাধীন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছিল।

২০০৪ সালে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সরকার মূলতঃ সেই অভিযানকেই অনুসরন করছে। র‍্যাব- দেশব্যাপী যাদের রয়েছে ১২টি পৃথক ব্যাটালিয়ন, আসলে তাদেরকে কোন জাত বা গোত্র ভুক্ত করা খুবই কঠিনঃ এরাও সেনা, পুলিশ এবং অন্যান্য বাহিনীর সমন্বয়ে গড়া একটি যৌথ বাহিনী। প্রকৃত পক্ষে, এটা এমনই এক বাহিনী, যারা বাংলাদেশ জুড়ে আইনহীনতা, বিভ্রান্তি ও ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে।

ক্ষমতাসীন সরকারের যেকোন নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া র‍্যাবের কোন গত্যন্তর নেই। তাদের আওতাভুক্ত দায়িত্বের বৈশিষ্ট্য হল, "সরকারের নির্দেশিত যে কোন অপরাধের তদন্ত করা" এবং "সরকার নির্দেশিত অনুরূপ অন্যান্য কর্তব্য পালন"। কার্যত, র‍্যাব সদস্যরা হল রাষ্ট্রের ভাড়া করা বন্দুক।

র‍্যাবকে হত্যার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। নিজেদের "সাফল্য" বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তাদের সদস্যদের দ্বারা ২৮৩ ব্যক্তি "গুলি বিনিময়ের সময় নিহত হয়েছে" বলে স্বীকার করেছে। বাংলাদেশে সাধারণত "ক্রসফায়ার" নামে পরিচিত শব্দাবলী বিভৎস বিচার বহির্ভূত হত্যার আরেক কথিত নাম। র‍্যাবের বর্ণনা অনুযায়ী, এর আদর্শ চিত্রনাট্য এরকমঃ সন্দেহভাজন একজনের গ্রেপ্তার হওয়া; শহরের বাইরে বা গ্রামের কোন স্থানে অবৈধ অস্ত্র বা অন্যান্য উপকরণ লুকানো আছে বলে তার স্বীকারোক্তি; মাঝরাত ও ভোররাতের মধ্যবর্তি কোন এক সময়ে র‍্যাবের তাকে নিয়ে কথিত বস্তু উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে গমন; সহযোগী সন্ত্রাসী বা অপরাধীদের দল পূর্বেই সেখানে অপেক্ষমান; দুই পক্ষের গুলি বিনিময়; আটক ব্যক্তির পলায়নের চেষ্টা এবং গুলিতে নিহত হওয়া। ঘটনার সমাপ্তি।

র‍্যাব কর্তৃক প্রকাশ্যে স্বীকৃত নিহতের সংখ্যার চেয়ে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানবাধিকার গ্রুপগুলোর হিসাব অনুযায়ী প্রকৃত সংখ্যা দুই বা তিনগুন বেশী। র‍্যাব গঠনের সময় থেকে এই বিষয়ে পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত হত্যার সংখ্যা উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। দু'টি বাহিনী তাদের সন্ত্রাস-বিরোধী, অর্থাৎ - কে কার চেয়ে বেশী মানুষকে হত্যা ও গ্রেপ্তারে পারদর্শী, সেই যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্যএকে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সংশ্লিষ্ট সদস্যরা র‍্যাব এবং অন্যান্য বাহিনীর মধ্যে অনায়াসে আসা যাওয়া করতে পারে। যেমন, র‍্যাবের পূর্ববর্তি অধিনায়ক এখন পুলিশ বাহিনীর প্রধান হিসেবে তার অর্জিত জ্ঞান নিজ বাহিনীতে ফিরে এসে প্রয়োগ করছেন। বাংলাদেশে সকল নিরাপত্তা বাহিনীর শৃংখলা এভাবেই ধীরে ধীরে দূর্বলতর হয়ে পড়ছে।

র‍্যাব এখন নির্যাতন, ডাকাতি ও চাঁদাবাজী সহ বহুবিধ অপকর্মের মাধ্যমে সেবা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত। এএইচআরসি ও তার সহযোগীদের সংগৃহীত ঘটনার মাধ্যমে জানা যায়, র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে মানুষকে আটক করে তাকে সম্ভাব্য সকল প্রকার যোগাযোগের সুযোগ বঞ্চিত অবস্থায় নিজস্ব হেফাজতে রেখে প্রহার ও নির্যাতন চালায় এবং মুক্তি দেওয়া বা

"ক্রসফায়ার" থেকে বাঁচানোর শর্তে পরিবারের সদস্যদের নিকট অর্থ দাবী করে। এধরণের ঘটনা বাংলাদেশের মানুষের জানা এবং স্থানীয় গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রকাশিতও হয়েছে।

অভিযোগের সংখ্যা ও মাত্রা এত ব্যপক হওয়া সত্ত্বেও র‍্যাব সদস্যদেরকে ফৌজদারী বিচারের মুখোমুখী করার একটি ঘটনা সম্পর্কেও আমরা অবগত নই। এধরণের কোন ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত থেকে থাকলে আপনি বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে জেনে দেখতে পারেন। র‍্যাব সদস্যরা একদিকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং আরেকদিকে বাংলাদেশের [সরকারের] অধীনস্ত ও ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকার প্রত্যাশী ব্যক্তিদের সামনে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা- উভয় কারণেই বেশ ভালোভাবেই দায়মুক্তি উপভোগ করে আসছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত যেসব চুক্তি, যেমন: *আন্তর্জাতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি* এবং *নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী কনভেনশন* এর অংশীদার হিসেবে যে দেশটি নিজেদের দাবি করে, তারা উক্ত দলিলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োজনীয় কোন আইনই কার্যকর করে নি। ফলে, গুরুতর অপকর্ম করার পরেও একজন র‍্যাব সদস্যের বিরুদ্ধে তার পূর্ববর্তি কর্মস্থল অর্থাৎ, সেনা বা পুলিশ বাহিনীতে ফিরে যাওয়া বা অন্য কোন নামমাত্র শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। কদাচিৎ, কেউ চাকরিচ্যুত হতে পারে। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রের কোন না কোন বিভাগে কর্মরত থেকেই যাচ্ছে।

এবার দেখুন, আপনার বিভাগের জন্য সমস্যা কোথায়: যেহেতু র‍্যাব একটি কুলীন বাহিনী হিসেবে বিবেচিত, এর সদস্যরা বা যারা এখানে দায়িত্ব পালন করে আসছে- তারা নির্দিষ্টভাবে মর্যাদাপূর্ণ জাতিসংঘ মিশনের জন্য মনোনীত হতে পারে। বস্তুত, এর দায়িত্বশীল কর্মককর্তাবৃন্দদের সবাই ইতোমধ্যেই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী অভিযানে অংশ নেওয়ার আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত: মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সরকার, যুগোস্লাভিয়া ও কসাভো শান্তিরক্ষা মিশনে; অতিরিক্ত মহা পরিচালক লেঃ কর্নেল মোঃ মাহবুবুল আলম মোল্লাহ্, ইরাক-কুয়েত পর্যবেক্ষণ মিশনে; পরিচালক (অপারেশন), লেঃ কর্নেল মির্জা এজাজুর রহমান, জর্জিয়ায় জাতিসংঘ সেনা পর্যবেক্ষণে; পরিচালক (গোয়েন্দা বিভাগ) লেঃ কর্নেল গুলজার উদ্দিন আহমেদ, কম্বোডিয়া ও সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ মিশনে; পরিচালক (তদন্ত বিভাগ) মিসেস ফাতেমা বেগম, সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে; পরিচালক (যোগাযোগ বিভাগ) কমান্ডার মোহাম্মাদ মঈনুল হক, লাইবেরিয়ায় জাতিসংঘ সেনা পর্যবেক্ষণ মিশনে; র‍্যাব-১ এর কমান্ডার লেঃ কর্নেল আসিফ আহমেদ আনসারী, মোজাম্বিকে জাতিসংঘ মিশনে; র‍্যাব-২ এর কমান্ডার অতিরিক্ত উপ-মহা পরিদর্শক এম আকবর আলী, কম্বোডিয়ায় শান্তিরক্ষা মিশনে; র‍্যাব-৩ এর কমান্ডার লেঃ কর্নেল ফরহাদ আহমেদ, ইরাকে জাতিসংঘ মিশনে; র‍্যাব-৪ এর কমান্ডার লেঃ কর্নেল মোঃ বদরুল আহসান, সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ মিশনে; র‍্যাব-৭ এর কমান্ডার লেঃ কর্নেল হাসিনুর রহমান, কুয়েতে জাতিসংঘ মিশনে; এবং, র‍্যাব-১০ এর কমান্ডার লেঃ কর্নেল মোঃ মানিকুর রহমান, বসনিয়া ও কঙ্গোয় জাতিসংঘ সেনা পর্যবেক্ষণ মিশনে ছিলেন।

এটা বলা নিস্প্রয়োজন যে, শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করে ইতিহাসের ক্রান্তিকালে গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের দায়ে অভিযুক্তরা জাতিসংঘের মর্যাদা বৃদ্ধিতে তেমন কিছুই করতে পারে না। এক্ষেত্রে, এএইচআরসি বলতে চায় যে, অধিকার লংঘনের জন্য নির্দেশদাতার দায়বদ্ধতা থাকার নীতি'র প্রতি আমরা দৃঢ়ভাবেই মনোযোগী: অধনস্তদের কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব উর্দ্ধতন কর্মকর্তার কাঁধেই বর্তাবে। এর মানে হল, র‍্যাব কর্মকর্তারা কোন একটি অধিকার লংঘনের ঘটনায় সরাসরী সম্পৃক্ত না থাকলেও তারা সমান ভাবেই দোষী। আমরা আশা করবো যে, এই নীতিতে আমাদের সাথে আপনিও সমবিশ্বাসী হবেন। আমরা আরোও মনে করি যে, র‍্যাবের মত একটি সমগ্র বাহিনী যেখানে প্রথাগত ও গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে, তাদের বা সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোকে জাতিসংঘ মিশনে সুযোগ দানের বিষয়টি আদ্যপান্ত আপনি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন।

অতএব, এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন আপনার প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন পূর্ণাঙ্গভাবে নিষিদ্ধ না করবে এবং অনুরূপ সকল যৌথ সেনা-পুলিশ অভিযানগুলো থেকে বিরত হবে, যা- ছেলে খেলার মত করে নিপীড়নমূলক ও বেআইনী গ্রেপ্তার, আটকাদেশ, প্রহার, নির্যাতন, ধর্ষন এবং বিচার বহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে, ততক্ষণ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী অভিযানগুলোতে পুনরায় বাংলাদেশী সৈন্যদের অংশগ্রহন নিষিদ্ধ থাকবে। যদি এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত না হয় এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সেন্যদের জাতিসংঘের কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে যে নীতি'র উপর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা ছাড়া এটা অন্য কিছু হিসেবে পরিগণিত হবে না।

এমনটা করা আপনার জন্য যে খুবই কঠিন এক কাজ হবে সেটাও আমরা বেশ বুঝতে পারি। যেহেতু বাংলাদেশ আপনার অভিযানগুলোতে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে সর্ববৃহৎ, এবং এমনকি যারা তাদের শান্তিরক্ষীদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশী অর্থও পেয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আপনার কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে একবারে বিরত রাখা, অন্ততঃ সারা বিশ্বে জাতিসংঘের উপস্থিতির ক্রমবর্ধমান ও সুস্পষ্ট বিপুল চাহিদার আলোকে অতটা সহজ হবে না। তা সত্ত্বেও, আমরা এটার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে সুবিবেচনাপ্রসুত, এবং কোন প্রকার আগাম বিচার ছাড়াই যথাযথভাবে বিবেচনা করার জন্য আমরা আপনার প্রতি আহবান জানাচ্ছি। এই বিশ্বাসও আমাদের আছে যে, ২০০৫ সালে আপনার কর্তৃত্বে আপনি নিজে যে মন্তব্য করেছিলেন, এই কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে, যা- দেশটির আন্তর্জাতিক অবস্থানকে ব্যাপকভাবে ক্ষতি করলেও তাদের সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের স্বার্থে আপনার জন্য এটা এক অদ্বিতীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়গুলোকে পরম গুরুত্বসহকারে নিয়ে আপনার দপ্তরের সাথে যেকোন ধরণের যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। যার ফলাফল শুধু মাত্রই ভাল হবে, বাংলাদেশের জন্য, তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য এবং জাতিসংঘের জন্যেও।

আমরা এখানে আপনাকে এও জানিয়ে রাখছি যে, আমরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানে বাংলাদেশের ভুমিকার পাশাপাশি দেশে তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘটিত নৃশংসতার ঘটনাগুলোও, বিশেষ করে, র‍্যাবের কার্যক্রম, যতক্ষণ না র‍্যাবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং সেখানকার মানবাধিকার লংঘনের শিকার ভিক্টিমদের কার্যকর প্রতিকার ও প্রতিদান দিতে দেশটি সক্ষম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান অব্যাহত রাখবো।

আমরা আপনার দ্রুত ও বিবেচনাপ্রসুত হস্তক্ষেপের প্রত্যাশায় রইলাম।

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তর, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
২। নির্যাতন সংক্রান্ত প্রশ্ন বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৩। বিচার বহির্ভূত হত্যা, সংক্ষিপ্ত ও নিবর্তনমূলক দন্ড বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৪। নারীর প্রতি সহিংষতা বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৫। চেয়ারপার্সন, নিবর্তনমূলক আটককরণ বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৬। মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।